দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ JAN. 14 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

ঘরে-বাইরে

— সন্ধানী

...রাজধানীর স্কুলে প্রায় ৩০ হাজার শিশু-কিশোর ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এর আগে গত ৭ তারিখ বেসরকারী স্কুলগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা শেষ হয়। এতেও হাজার হাজার শিশু-কিশোর অংশ নেয়। বেসরকারী স্কুলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী চাপ সৃষ্টি হয় মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও ভিকারুন্নেসা স্কুলে। সরকারী স্কুলগুলোতে এবার শূন্য আসন ছিল কারো কারো মতে ৫ হাজার। আবার কারো কারো মতে ৬ হাজার। প্রতিটি আসনের জন্য গড়ে ৬/৭ জন পরীক্ষা দেয়। এর মাঝে মাধ্যমিক স্তর অপেক্ষা শিশু শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু প্রার্থীর গড় হার ছিল অধিক। অন্যদিকে ভর্তির চাপ সব স্কুলে সমান ছিল না। সরকারী স্কুলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী চাপ সৃষ্টি হয় ল্যাবরেটরী স্কুল, মতিঝিল বয়েজ এন্ড গার্লস স্কুল এবং ধানমন্ডি স্কুল প্রভৃতিতে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কারা উত্তীর্ণ হয়েছে এখনও তা পুরোপুরি জানা যায়নি। তবে যার ভাগ্যেই শিকা ছিঁড় ক. সরকারী স্কুলগুলোর ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অন্ততঃ ২৪/২৫ হাজার পরীক্ষার্থী কিছুতেই ভর্তির সুযোগ পাবে না। তাদের একটি অংশ হয়তো আগামী বছরের জন্য অপেক্ষা করবে। বাকী অংশটি ভালো স্কুলে পড়ার আশা বিসর্জন দিয়ে ভর্তি হবে শহরের বিভিন্ন স্কুলে।

ভর্তি পরীক্ষা সাংবাৎসরিক একটি উদ্বেগের বিষয়। প্রতিবছর ভর্তির সময় আসে। মা-বাবার চোখের ঘুম নষ্ট হয়ে যায়। ৬/৭ মাস আগে থেকেই তারা সন্তানকে ভর্তি করার জন্য প্রস্তুত করতে থাকেন। এই লক্ষ্যে বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে ভর্তি করা হয়। কেউ কেউ মোটা অংকের ফি দিয়ে প্রাইভেট টিউটর রাখেন। প্রাইভেট টিউটররা নানাভাবে ভর্তির যোগ্য করে তোলার চেষ্টা চালান। এতে কোন কোন শিশুর উপর বয়সের তুলনায় অধিক চাপ পড়ে। এতেও সফল হওয়া যাবে কি যাবে না এই আশঙ্কায় অভিভাবকরা প্রভাবশালী বিভিন্ন মহলে ধরনা দেন। এরপর ভর্তি পরীক্ষার নামে শুরু হয় যুদ্ধ। উদ্বিগ্ন মা-বাবা সন্তান-সন্তুতি নিয়ে স্কুলে ভীড় জমান। কোন কোন স্কুলের বহিরাঙ্গন অভিভাবকদের ভীড়ে জনারণ্যে পরিণত হয়। এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, পরীক্ষার পর সন্তানকে খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে পড়ে। মা-বাবার এদিকে-সেদিকে ছুটাছুটি আরম্ভ হয়ে যায়। এবার সবচেয়ে বেশী হৈ-হট্টগোল বাঁধে ল্যাবরেটরী স্কুল, ভিকারুন্নেসা স্কুল ও মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলে। পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য এক পর্যায়ে কলাপসেবল গেট বন্ধ করে ল্যাবরেটরী স্কুল কর্তৃপক্ষ পুলিশ ডাকতে বাধ্য হন। পুলিশ এসে শৃংখলা ...করতে সাহায্য করে। স্কুল কর্তৃপক্ষ এরপর কলাপসেবল গেট খুলে একজন একজন করে শিশুদের তুলে দেন তাদের মা-বাবার হাতে। এরই মাঝে সৃষ্টি হয় করুণ দৃশ্য। ভয়ার্ত শিশুদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। কেউ কেউ কান্নাকাটি আরম্ভ করে দেয়। প্রশ্ন হচ্ছে, বছরের পর বছর ধরে ভর্তি নিয়ে এই যে তুলাকালাম কান্ড, এর কারণ কি? একি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতার জন্য?

প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দেশে পর্যাপ্ত নয়। প্রতিবছর যত শিশু ভর্তি হওয়ার বয়সে পৌঁছে এর সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় না। ফলে কিছুটা সংকট থেকেই যায়। এর সমাধান করার জন্য চলতি বছর ২৪টি সরকারী স্কুলে দু'শিফট চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। গত ৫ তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সন্দেহ নেই যে, এতে ভর্তির চাপ কিছুটা হ্রাস পেতে পারে। 'কিছুটা' বলছি এজন্য যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা ভর্তির চাপ সৃষ্টি হওয়ার একমাত্র কারণ নয়। এর আরো অনেক কারণ আছে। এর মাঝে প্রধান হলো ভালো স্কুলের অভাব। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্নস্থানে হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাতে গোণা কয়েকটি মাত্র। ঢাকা শহরে ২৪টি সরকারী স্কুল ছাড়াও বেসরকারী স্কুল আছে অনেক। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রতিবছরই আঙ্গুলে গোণা চার-পাঁচটি স্কুলে ভর্তির দুঃসহ চাপ সৃষ্টি হয়। হাজার হাজার অভিভাবক এই স্কুলগুলোতে ভীড় করেন। পত্র-পত্রিকায় এসব স্কুলে ভীড় হওয়ার সচিত্র সংবাদ পরিবেশিত হয়। বাকীগুলোর কোন খবর থাকে না। কারণ সেসব স্কুলে ভীড় কম। প্রায় নেই বলা চলে। শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার দু'-তিনমাস পরও ভর্তি করা যায়। সচরাচর কোন পরীক্ষাও দিতে হয় না। এসব স্কুলে ভীড় না হওয়ার মূল শিক্ষার মান। কোন কোন স্কুলে শিক্ষার মান এতই নীচু যে বলার নয়। কোন মা-বাবাই এসব স্কুলে তাঁর সন্তানদের ভর্তি করতে উৎসাহবোধ করেন না।

এক সময় এই নিচু শিক্ষামানের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনিয়মিত বেতন-ভাতার বিষয়টি উল্লেখ করা হতো। বাস্তবেও ঘটনা ছিল সত্য। বেশীরভাগ বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা তখন নিয়মিত বেতন-কড়ি পেতেন না, একমাস বেতন পেলে আবার ক'মাস পরে পাওয়া যাবে তা ছিল অনিশ্চিত। ফলে নিছক বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই তাঁদের ভিন্ন কাজ করতে হতো। বিকল্প চাকরি ছাড়াও কেউ কেউ নানা রকম কাজ করতেন। পরিণামে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানস্পৃহা জাগিয়ে তোলার জন্য মনোযোগ দিয়ে পড়ানো সম্ভব হতো না। অনেক সময়ই তাঁরা ক্লাস নেয়া থেকে বিরত থাকতেন। কিন্তু বর্তমানে সে অবস্থা নেই। এখন বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরাও সরকারী অনুদান হিসাবে শতকরা ৮০ ভাগ বেতন পান। বাকী থাকে মাত্র বিশভাগ। এই বিশভাগ ছাত্র বেতনসহ বেসরকারী স্কুলের বিভিন্ন আয় থেকে দেয়া অসম্ভব নয়। তাই বলা যায়, আগে যে পরিস্থিতি ছিল এখন তা নেই। বর্তমানে পরিস্থিতি অনেকখানি উন্নত। এ অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানস্পৃহা জাগিয়ে তুলতে ব্যর্থ হওয়ার তেমন কোন কারণ নেই। এরপরও বেশীরভাগ স্কুলে শিক্ষার মান অতিশয় নীচু। এর বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তবে এর একটি কারণ নিয়মিত ক্লাস গ্রহণে শিক্ষকদের একাংশের অনীহা। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, আজকাল শিক্ষকদের একটি অংশ যেনতেন প্রকারে অর্থ উপার্জনকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। নিয়মিত তারা ক্লাস নেন না। স্কুলে ক্লাস নেয়ার প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করে কেউ কেউ গড়ে তুলেছেন গুরুগৃহ। এসব গুরুগৃহে দলবদ্ধভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানো হয়। এতে যারা প্রাইভেট পড়ে হয়তো তারা কিছুটা উপকৃত হয় এবং শিক্ষক মহোদয় অর্থ উপার্জন করতে পারেন। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয় স্কুলের শিক্ষার মান। স্কুলে নিয়মিত ক্লাস হয় না বলে শিক্ষার মানের অধোগতি ঘটে। আর তাই নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে হাতে গোণা কতিপয় স্কুলে সৃষ্টি হয় ভর্তির দুঃসহ চাপ। শিক্ষকদের সচ্ছল জীবন-যাপন করার আকাঙ্ক্ষা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আর দশজনের মতো তাঁরাও ভালোভাবে দিনযাপন করার চেষ্টা করবেন ইহাই স্বাভাবিক। তবে শিক্ষকের মৌলধর্ম বিসর্জন দিয়ে নয়। তিনিই আদর্শ শিক্ষক যিনি শিক্ষার্থীর জ্ঞানস্পৃহা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হন। এ কাজটি করে যদি আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয় তাহলে বলার কিছু থাকে না। সে অবস্থায় বিভিন্ন স্কুলে ভর্তির যে চাপ সৃষ্টি হয় তাও কমে আসতে পারে।

শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ সবচে বেশী। প্রতি বছর এই খাতে শত শত কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এত টাকা অন্যকোন খাতে বরাদ্দ করা হয় না। এর উদ্দেশ্য শিক্ষার প্রসার ও মান উন্নয়ন। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি বড় হতে পারে না। দারিদ্র্য বিমোচনসহ সবকিছুর জন্য চাই শিক্ষা। বর্তমান বিশ্বে মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয় ইহাও শিক্ষার প্রসারের সাথে যুক্ত। কোন কোন মনীষীর মতে, শিক্ষা জীবনের শতকরা আশিভাগ সমস্যার সমাধান করে। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, এই শিক্ষার ক্ষেত্রে এখনো আমরা ততটা অগ্রসর হতে পারিনি। শিক্ষিতের হার কোনক্রমে শতকরা ত্রিশ জনের বেশী নয়। বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করায় এখানে-সেখানে দু-একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাহ্যিক রূপে আসছে পরিবর্তন। আগে যেগুলো ছাপড়া ঘর ছিল এখন তা দালান। পুরনো আসবাবপত্রের স্থান দখল করেছে নতুন আসবাবপত্র। কিন্তু শিক্ষার মানের তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। আগে যা ছিল কমবেশী তাই আছে। এর প্রতিকারের জন্য প্রয়োজন জবাবদিহিতার ব্যবস্থা। এমন কিছু একটি করা যাতে ফাঁকি-ঝুকি দিয়ে কেউ পার না পায়। এ প্রসঙ্গে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীর ইতিপূর্বেকার একটি সিদ্ধান্তের বিষয় স্মর্তব্য। বিভিন্ন মাধ্যমিক স্কুলের পরীক্ষার ফলাফল শূন্য ও অত্যন্ত নিম্নহারের হওয়ায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল— যে স্কুল থেকে একজনও পাস করতে পারেনি উহার অনুমোদন বাতিল করা হবে। যুক্তির দিক থেকে সিদ্ধান্তটি নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার কিছু ছিল না। কেননা, সরকারী টাকা গৌরিসেনের টাকা নয় যে, যেমন খুশি ব্যয় করা যেতে পারে। কিন্তু এরপরও বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। কোন কোন মহল প্রতিবাদ করেছিলেন। এর মূলে ছিল পূর্বে কোন সতর্কবাণী উচ্চারণ না করা। সে যা হোক, অতীত নিয়ে ঘাটা-ঘাটি করে কোন লাভ নেই। প্রতি বছর সন্তানকে ভর্তি করতে গিয়ে যে টেনশনে পড়তে হয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার মান মোটামুটি উন্নত করা গেলেও এর কিছুটা প্রতিকার হতে পারে। তাই আমরা মনে করি, সু-সজ্জিত দালান-কোঠা তৈরীর চেয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নের বিষয়টি অধিকতর অগ্রাধিকার লাভ করার যোগ্য। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের দায়িত্ব সচেতনতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। কিন্তু তা করতে চাই না। শিক্ষকরা সমাজের সচেতন শ্রেণীর অংশ। যে উদ্দেশ্যে জনগণের কষ্ট প্রদত্ত অর্থ হতে অনুদান দেয়া হয় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলে এক সময় অনুদান কাটা যেতে পারে তা তাদেরও জানা। ❑